গেরিলা আন্দোলনের পর্যালোচনা

সাজ্জাদ জহির

পশ্চিমাদের হাতে মুসলিম বিশ্বের আধিপত্য খর্ব হওয়ার পর থেকে শুরু হওয়া সংঘাত ও আন্দোলনের ব্যাপারে আমরা ছিলাম অসচেতন। আমাদের দেশে ইসলামি আন্দোলনগুলোর ক্রমাগত ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ এটি। ব্যর্থতা বলতে এখানে আত্মত্যাগের ফলাফল হাতছাড়া হওয়া এবং মুসলিমদের কর্তৃত্ব প্রবল না হওয়াকে বোঝানো হচ্ছে। যুগের পর যুগ পার হওয়া সত্ত্বেও, ইসলামের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনার কার্যকর রোডম্যাপ আমরা তৈরি করতে পারিনি। অসফল আন্দোলন বলতে কেবল নিয়মতান্ত্রিক দলগুলোকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে, এমন নয়।

বরং, গতানুগতিক 'নিয়মতান্ত্রিক' মেহনতের বাইরে গিয়ে গেরিলা হামলার মানহাজকে যারা গ্রহণ করেছেন, তারাও এ শিবিরের অন্তর্ভুক্ত। কথাগুলো এধারার বন্দী, নিহত ও হিজরতের পথে ক্রমাগত সফর করা সদস্যদের আত্মত্যাগকে স্বীকার করে নিয়েই বলা হচ্ছে। এসকল ব্যক্তিদের চেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা ও মুল্যায়নের দাবি থেকেই কথাগুলো বলা হচ্ছে। যেন তাদের রক্ত আর ঘাম বৃথা না যায় এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম তাদের আত্মত্যাগের সুফল ভোগ করতে পারে। এটাও ঠিক যে, অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় শারঈভাবে তাদের জবাবদিহিতা ইন শা আল্লাহ অনেক কম। তবে, যারা অন্যায় রক্তপাত ঘটিয়েছে, তাদের কথা ভিন্ন। বিশেষত দায়েশ বা আইএস আহলুস সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত এবং ঢালাও তাকফির ও রক্তপাতের সাথে সম্পৃক্ত বিধায় তাদের নিয়ে আলোচনা এখানে করা হচ্ছে না। এছাড়াও, অন্যান্য সংগঠনগুলোর মাঝেও অন্যায় রক্তপাত ও বিভ্রান্তির যে সকল দিক প্রকাশ পেয়েছে তার সাথে একমত পোষণ করার প্রয়োজন নেই। তবে দায়েশ ছাড়া বাকি সংগঠনগুলো ভালো-মন্দের মিশ্রণেই রয়েছে।

শায়খ আবু মুসআব আস-সুরি তিনটি প্রজন্মে নবুওয়াতী মানহাজের উপর পরিচালিত বিপ্লবীদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। এবং চলমান ৩য় প্রজন্মকে আহ্বান করেছেন আগের দুই প্রজন্মের ফিকর ও মেহনতের সাথে নিজেদের যুক্ত করতে।

শুধুমাত্র হাকিমিয়াহ, গণতন্ত্র বা দারুল হারবের মাসআলায় সঠিক অবস্থান জানাকেই যারা মানহাজের ব্যাপারে জ্ঞান রাখা মনে করেন, তারা আসলে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের ফিকর, ইতিহাস ও পরিকল্পনা জানার ব্যাপারে মনোযোগ দেননি। ফলে আমরা দেখি, সালাফদের চিন্তাধারা ও আন্দোলনের আলোকে কার্যকর মানহাজের রূপরেখা এখনো আমাদের সামনে আসেনি।

আমাদের দেশে যাদেরকে "মানহাজি" শ্রেণীটির অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়, বিগত ৩০ বছরে তাদের মেহনত, বিবৃতি, অডিও-ভিডিও, প্রবন্ধ ও প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ করলে, এবাস্তবতাই উঠে আসে। তাদের মেহনত অত্যন্ত উপকারী হলেও পূর্ণাঙ্গ মানহাজের আলোচনা আমাদের সামনে আসেনি। এ দুঃখজনক বাস্তবতার মূল কারণ হল, এই মহান আন্দোলনের নেতৃত্বের ইতিহাস, অধ্যায়ন, লেখনি, মেহনত ও ফিকরের ব্যাপারে হতাশাজনক পর্যায়ের উদাসীনতা। এবিষয়টি অপ্রচলিত ধারার সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রে সমধিক প্রযোজ্য।

শায়খ আবু মুসআব তাঁর "দাওয়াতুল মুকাওয়ামা"-তে এ ব্যাপারে অত্যন্ত উপকারী আলোচনা করেছেন। যে আলোচনার নির্যাস হচ্ছে—

> "১৯২৪ সালে খেলাফতের পতন হয়। এরপর আমাদের স্পষ্ট দুশমনরা অর্থাৎ রোমানদের উত্তরসূরী পশ্চিমারা ও তাদের দেশীয় দালালরা আমাদের সাথে দ্বীনি, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ময়দানে যা ক্ষতিই করেছে—তার সমস্ত দিকের জ্ঞান বিপ্লবী প্রজন্মের থাকা উচিত।
>
> হক ও বাতিলের মাঝে চলমান সংঘাতের সারকথা ইতিহাস অধ্যায়নের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। যখন আপনি

ইতিহাস পড়বেন এবং এই বৈশ্বিক কুফরের অনিষ্টতা, কপটতা উপলব্ধি করবেন, কেবল তখনই বুঝতে পারবেন কেন সংঘাত ও আন্দোলন অপরিহার্য ছিল।

যখন থেকে সেক্যুলার লিবারেল পশ্চিমা আধিপত্য বিশ্বে প্রবল হয়েছে, তখন থেকেই এই অপশক্তি কিভাবে মানবতা ও মানুষের হকের ক্ষতি করে আসছে, তা যখন বুঝে আসবে তখন আন্তরিকভাবে বুঝতে পারবেন, কেন আপনারা সংগ্রাম করছেন এবং এই সংঘাত ও বিপ্লবের প্রয়োজন কেন।

ভবিষ্যৎ মারহালার জন্য ধারাবাহিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ এক মানহাজ পেশ করার জন্য আমি লিখছি।

অতীত অধ্যয়ন এবং এর ব্যাপারে অবগত হওয়া একটা লম্বা শিকলের ন্যায়, যা মানবজাতি ও সংগ্রামের ইতিহাসের সাথে আমাদের সংযুক্ত করে। অতীত ইতিহাস ও সংগ্রামের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে সাধারণ বিপ্লবী বা মুজাহিদরা যদি অজ্ঞ হয়, তাহলে তা ব্যক্তিগতভাবে তার জন্য ঠিক হতে পারে। তার জন্য এসমস্ত কথার এত জরুরত নেই, সে আনুগত্য করে যাবে।

কিন্তু সুনির্বাচিত, অগ্রগামী বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ এবং ভবিষ্যতে আগত প্রজন্মের জন্য একথার অনুমতি নেই যে, তারা এই চলে যাওয়া যুগ ও বিপ্লব, সংগ্রামের পর্যায় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে না। অতীত প্রজন্ম থেকে উপদেশ হাসিল করবে না, ঘটনাবলীর হিকমতকে বুঝবে না, এটা তাদের জন্য জায়েজ নয়।

মানহাজ থেকে দূরে থাকা সাধারণ সদস্য বা আনুগত্যকারীর জন্য এর অনুমতি থাকতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি সমগ্র উম্মাহর নেতৃত্বে অংশ নিতে চায়, উম্মতের নষ্ট হয়ে যাওয়া প্রজন্মের খেদমত করতে চায়, এসব ব্যাপারে অজ্ঞতার ব্যাপারে তার তার কোনো অজুহাত নেই।

শরীয়াহ শাসন, উসমানি খেলাফতের পতন কেন হয়েছে, কোন লোকদের হাতে হয়েছে? এই ইহুদি খ্রিস্টান পশ্চিমা সভ্যতা আমাদের কি কি ক্ষতি করেছে? এ বিষয়গুলো তার জানা থাকা উচিত। এমনকি পৃথিবীর সুচনা থেকে আজ পর্যন্ত হক ও বাতিলের মধ্যে যে লড়াই চলছে, তার দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য কী এবং আর ত্রুটি কোথায়, সবই জানা মুজাহিদের জন্য জরুরি।

তাই এই সময়ের মুসলিমদের হাতিয়ারসমূহের মধ্যে এক অতিগুরুত্বপূর্ন হাতিয়ার হলো এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা।

উস্তাদ আব্দুল কাদের আওদাহ বলেন,

“জাহেল ব্যক্তি এই উম্মতকে চালাতে পারবে না, চাই তার যতই ইখলাস থাকুক না কেন।”

(শায়খের বক্তব্যের সারকথা সমাপ্ত)

তাই ইসলামি আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারীদের ফিকরের পরিচ্ছন্নতা ও বাস্তবতার যথাযথ জ্ঞানের আলোকে ভবিষ্যত কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে। নয়তো ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণে ব্যাপক ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে না। এটা নিয়মতান্ত্রিক প্রকাশ্যে মেহনতকারীদের জন্য যেমন সত্য, গোপনে অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকারীদের জন্যও সমান সত্য। চাই, তাদের থেকে প্রচন্ড পরিভাষা, আবেগাপ্লুত আহবান কিংবা দূর্দান্ত দাবির সমাবেশ ঘটুক না কেন!

[২]

সপ্তদশ শতাব্দীর ওয়েস্টফিলিয়া চুক্তি, ব্রিটেনের ‘গ্লোরিয়াস’ বিপ্লব, অষ্টাদশ শতাব্দীর মার্কিন ও ফরাসী বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব, ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ এবং উসমানী সাম্রাজ্যের পতনের ফলে, ইউরোপের জাতিরাষ্ট্রের ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়। গত শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বে এই ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হয়। তখন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, সারা বিশ্বে এই ব্যবস্থা মজবুতভাবে জেঁকে বসেছে। এই শাসনযন্ত্রের বিপরীতে বিপ্লবী কার্যক্রম পরিচালনার প্রক্রিয়া অল্প কয়েকটি ধারাতেই সীমিত হয়ে

গেছে।

আবার, স্নায়ুযুদ্ধের দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে চলমান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক কার্যক্রম ও সংগঠনের রাজনৈতিক লাইনের বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা নেয়ার ক্ষেত্রে এসকল সেক্যুলার বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো থেকে কিছু বিশ্লেষণ মুসলিমদের গ্রহন করার প্রয়োজন হয়েছে। যেমন:

- পিরামিড ধাঁচের 'হায়ারার্কিকাল' গোপন সংগঠনের ধারণার বড় একটি অংশ এসেছে ভ্লাদিমির লেনিন ও রুশ বিপ্লবীদের কর্মপন্থা থেকে।
- হিকমাতুল্লাহ লোদীর 'নিসাবে হারব' চীনের লোকজ বিপ্লবী ধারার গেরিলা যুদ্ধের পরিবর্তিত রূপ।
- শায়খ আবু উবাইদা আল কুরাইশীর "বৈপ্লবিক যুদ্ধসমূহ"-এ মাও সে তুং-এর এবং আরও একাধিক প্রবন্ধে প্রুশিয়ান জেনারেল ক্লাউসভিতস এর চিন্তাধারার বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক ইসলামি আন্দোলনের ধারণার পেছনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা 'চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ'/Fourth generation warfare –এর ধারণা তিনি নিয়েছেন মার্কিন বিভিন্ন সামরিক বিশ্লেষকের গবেষণা থেকে।
- শায়খ আবু মুসআব লিডারলেস না নেতৃত্বহীন আন্দোলনের ধারণা এনেছেন মার্কিন ফার রাইট বা উগ্র ডানপন্থী আন্দোলনের তাত্ত্বিকদের থেকে।

কাজেই বিপ্লব এবং সংগঠনের কর্মপদ্ধতির মতো বিষয়গুলোতে বিভিন্ন ঘরানা থেকে প্রয়োজনমতো উপাদান গ্রহণ করার বিষয়টি ইসলামি আন্দোলনের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

আমাদের আলোচনার জন্য, আমরা বামপন্থী বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধারার দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারি। মার্ক্সবাদী আন্দোলনকে সাধারণত মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট আন্দোলন বলা হয়। যার বাস্তব সফলতা প্রথম দেখা যায় লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে সংঘটিত অক্টোবর বিপ্লবে।

আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ কর্তৃক নির্ধারিত অগ্রগামী ভূমিসমূহের দিকে তাকালে, এবং শায়খ আবু উবাইদা আল কুরাইশি (রহ.) এর রচনাবলীর ক্ষেত্রে লক্ষ্যপাত করলে বোঝা যায় যে, সোমালিয়া, আফগানিস্তান, ইয়েমেন, মালি, পাকিস্তানের মতো ভূমিগুলোতে কিংবা ইরাকের ময়দানে মূলত জনযুদ্ধভিত্তিক গেরিলা আন্দোলনের ধারাকে সামনে রেখে নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব অঞ্চলে আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে বিপ্লবীরা শুরু থেকেই সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মকৌশলের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সমন্বয় গড়ে তোলেন। এই সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানীয় জনসমর্থনকে সংগঠিত করে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধযুদ্ধের কাঠামো নির্মাণ করে বিপ্লবীরা অগ্রসর হয়েছেন।

বহিঃশক্তির আগ্রাসন হলে বা স্থানীয় প্রশাসন ব্যাপকভাবে জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে, বিপ্লবীরা প্রান্তীয় দুর্গম অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়বে। তারপর গেরিলা আক্রমণের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল দখলের মাধ্যমে শহর দখলের দিকে অগ্রসর হবে। কারণ প্রত্যন্ত ও গ্রামাঞ্চলে শাসকগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ দুর্বল থাকে। সংক্ষেপে এটা হল জনযুদ্ধভিত্তিক গেরিলা ধারার পদ্ধতি।

এই গেরিলা আন্দোলনের ধারা—যে নামেই ডাকা হোক না কেন— আমাদের মতো দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ গেরিলা যুদ্ধের সফলতার বেশ কিছু পূর্বশর্তের ব্যাপারে মুসলিম ও অমুসলিম, সকল ধরণের সমরবিশেষজ্ঞ একমত, এবং এ বৈশিষ্ট্যগুলো বাংলাদেশে অনুপস্থিত।[1] দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা আন্দোলন আমাদের দেশে সম্ভব নয় তা মোটামুটি তাত্ত্বিক, বাস্তব এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে স্পষ্ট। বাংলাদেশে ইতিপূর্বে এ ধারায় যেসব প্রচেষ্টা হয়েছে, তার প্রতিটিই ব্যর্থ হয়েছে।

সেক্যুলারদের মধ্যেও এই ধারায় কাজের চেষ্টা হয়েছিল, তারাও ব্যর্থ হয়েছে। ষাটের দশকের একদম শেষদিকে জনযুদ্ধভিত্তিক

গেরিলা যুদ্ধের লক্ষ্যে সংগঠন গড়ে তুলেছিল সিরাজ শিকদার। পরবর্তীতে জাসদের গণবাহিনীও এপথে কিছুটা চেষ্টা করেছিল। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মিলেছে ব্যর্থতা।

এ ব্যাপারে গণবাহিনীর একটি অঞ্চলের তৎকালীন নেতা, নাগরিক ঐক্যের মাহমুদুর রহমান মান্নার একটি বক্তব্য প্রাসঙ্গিক। মান্না বলেছিল–

> "এ দেশে গেরিলা যুদ্ধের কোনো সুযোগ নেই।"

চীনা ধারার গ্রামকেন্দ্রিক জনযুদ্ধভিত্তিক বিপ্লবের তত্ত্ব যে উপমহাদেশে (এবং বাংলাদেশে) অচল, এ প্রসঙ্গে বামপন্থীদের নানা বিশ্লেষণও আছে। যেমন SUCI (Socialist Unity Center of India)-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বামপন্থী তাত্ত্বিক শিবদাস ঘোষ বলেন,

> "মাও সে তুংয়ের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, প্রাকবিপ্লব চীনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল আধা ঔপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক এবং তার চরিত্র ছিল প্রাকপুঁজিবাদী বিকেন্দ্রীভূত এবং মধ্যযুগীয় (প্রি ক্যাপিটালিস্ট ডিসেন্ট্রালাইজড মেভিয়্যাভাল নেচারের) । উপরন্তু, গোটা চীনে অখণ্ড সুসংহত কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল না।
>
> সমগ্র চীন দেশটা বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের প্রভাবিত অঞ্চল হিসেবে আলাদা আলাদা টুকরোতে বিভাজিত ছিল এবং এই সমস্ত অঞ্চলগুলো আলাদা আলাদাভাবেই সাম্রাজ্যবাদীদের তাবেদার কতগুলো ওয়ারলর্ডদের দ্বারা শাসিত হতো।
>
> ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনব্যবস্থার সাথে কি এর কোন মিল আছে? বরং এখানে একটি অত্যন্ত সুসংহত কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদ্যমান। রাষ্ট্রের প্রকৃতির দিক থেকে আমাদের দেশের বিপ্লবের তত্ত্ব চীনের বিপ্লবের তত্ত্বের সাথে এক হতে পারে না।"

শিবদাস ঘোষের উপসংহার ছিল চীনের মতো গ্রামাঞ্চলে মুক্ত এলাকা তৈরি করে শহর দখল করার কৌশল উপমহাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না। তার মন্তব্য হলো,

> "লড়াইটা যে দেশেই শাসকশ্রেণীর বিরদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিবে, সে দেশেই গেরিলা যুদ্ধের নীতি ও সংগ্রামকৌশল সেই দেশের বিপ্লবীদের গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া প্রতিটি দেশের নিজস্ব আলাদা বৈশিষ্ট্যের জন্য যেখানেই বিপ্লবী শ্রেণী শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এই গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্বে ও কৌশলে কিছু না কিছু সংযোজন ঘটাতে বাধ্য হবেন। তা না হলে তারাও কেবল 'কপি' করে চালাতে পারবেন না।
>
> ফলে আপনারা বুঝতে পারছেন, গেরিলা যুদ্ধের কৌশল গ্রহণ করার সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে মুক্ত এলাকা সৃষ্টি করে শহর দখল করার সংগ্রাম কৌশল এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব গ্রহণের, যা নকশালপন্থীরা এক করে ফেলেছেন, তার কোনো সম্পর্ক নেই।"

উম্মাহর নেতৃবৃন্দের বিশ্লেষন এবং এ ভূখন্ডের পর্যালোচনার আলোকে এই অনুসিন্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, আমাদের দেশে আপাতদৃষ্টিতে গেরিলা যুদ্ধের কোনো সুযোগ নেই।

এমনকি চরম বৈরী হানাদার গোষ্ঠীর উপস্থিতি এবং সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমর্থন সত্ত্বেও অতীত ইতিহাস এদেশে এ পদ্ধতির ব্যর্থতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন, ১৯৩০ এ চট্টগ্রামে সূর্যসেনের নেতৃত্বাধীন গেরিলা আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল।

এখানে ব্যতিক্রম হিসাবে ১৯৭১-কে টানার সুযোগ নেই। কারণ '৭১ এর যুদ্ধ যতটা পূর্ববাংলার, ততটাই ভারতীয়দের। এছাড়াও, স্থানীয় প্রশাসনের অসহযোগিতা এবং ১১০০ মাইল দূরের কমান্ড সেন্টার, যুদ্ধ শুরুর আগেই পশ্চিম পাকিস্তানী প্রশাসনের জেতার সম্ভাবনা শেষ করে দেয়। এর সাথে আরো যোগ করা যায় যে, ১৯৬৫ এর যুদ্ধের পর অস্ত্র বিক্রির ক্ষেত্রে আরোপিত আমেরিকান

অবরোধের সুবিধা নিয়ে ভারতীয় বাহিনীর ব্যাপক বিমান হামলার ফলে যুদ্ধ রাতারাতিই শেষ হয়ে যায়। তাই '৭১ এর যুদ্ধকে ঢালাওভাবে গেরিলা যুদ্ধ বলা আসলে সঠিক না। বরং, সেমি-কনভেনশনাল দীর্ঘমেয়াদী জনযুদ্ধ বলা যেতে পারে। এতে গেরিলা যুদ্ধেরও কিছু উপাদান উপস্থিত ছিল, কিন্তু তা ঐ অর্থে গেরিলা আন্দোলন নয়।

কাজেই তিউনিশিয়া, মরক্কো, মিশর বা বাংলাদেশের মতো ভূমিগুলোতে আফগান, সোমালিয়া বা ইয়েমেনের মতো গ্রামাঞ্চল বা প্রত্যন্ত অঞ্চল কেন্দ্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামি শাসন ফিরিয়ে আনার চিন্তা করাটা বাস্তবসম্মত নয়।

নিকট অতীতে সমতল ভূমিতে ইসলামি আন্দোলনের ব্যাপকতা ও সফলতার কিছুটা বাস্তবতা দেখা গিয়েছে শামে। লিবিয়াতেও প্রচ্ছন্ন কিছু ফলাফল পাওয়া গেছে। অন্যদিকে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও 'গণতান্ত্রিক' প্রতিবিপ্লবীদের কারণে নষ্ট হয়েছে তিউনিশিয়া ও মিশরে শরীয়াহ শাসন ফিরিয়ে আনার সুযোগ!

এই বাস্তবতাগুলো সামনে রাখলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, আমাদের মতো সমতল ভূমিতে অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে ইসলামি শাসন ফিরিয়ে আনার রূপরেখা কী হতে পারে? ইতিহাস, বাস্তবতা, প্রাজ্ঞ উলামা ও নেতৃবৃন্দের চিন্তার আলোকে কর্মকৌশল এক্ষেত্রে কী?

এ ব্যাপারে সদুত্তর খুঁজে বের করতে হবে। না পারলে বা খোঁজার মেহনত না করা হলে, ইসলামি শাসন ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় লিপ্ত সংগঠনগুলো ব্যর্থতার গর্ত থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না।

তাই সময়ের অনিবার্য দাবি হচ্ছে—শাম ও ইরাকের প্রতিবিপ্লবী ইসলামপন্থীদের পরিণতি থেকে শিক্ষা নেয়া এবং শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম, শায়খ উসামা আবু আবদুল্লাহ ও শায়খ আইমান আবু মুহাম্মাদের মানহাজকে আঁকড়ে ধরা।

সংগ্রামী ও আত্মত্যাগী ইসলামপন্থীদের জন্য তাই করণীয় হচ্ছে—কেবল দাবিতেই সীমাবদ্ধ না থেকে সংগঠন ও আন্দোলনে বিশুদ্ধ মানহাজ ও রাজনৈতিক লাইনের বাস্তব প্রতিফলন ঘটানো।

আল্লাহই ভালো জানেন।

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

> "আমি আমার সাধ্যমতো সংশোধন চাই। আল্লাহর সহায়তা ছাড়া আমার কোনো তওফীক নেই। আমি তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাই।" (সূরা হুদ, ১১:৮৮)

---

[1] মোটা দাগে এগুলো হল, স্ট্র্যাটিজিক ডেপথ (strategic depth), রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত শক্তির আওতার বাইরে ঘাটি অঞ্চল হবার মতো উপযোগী জায়গা, একাধিক স্থল সীমান্ত, অস্ত্রের সহজলভ্যতা, গোত্রীয় সমাজ, জনগণের মধ্যে মার্শাল স্পিরিট (martial spirit), এমন স্পষ্ট শত্রু থাকা যার আগ্রাসনের বিষয় জনগণের কাছে মোটা দাগে স্পষ্ট। এসব পূর্বশর্তের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন এ প্রবন্ধে আলোচিত লেখকদের রচনাবলী।